গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১২ সংখ্যা | ১ - ৭ নভেম্বর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | ▪ পৃ. ১

শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে

১৩ নভেম্বর নবান্ন অভিযান

ফিরছে পাশ-ফেল প্রথা। খবরের কাগজের হেডিংয়ে কথা ক'টি দেখেই উচ্ছ্বসিত কলেজ স্ট্রিট নিবাসী এক প্রৌঢ়া প্রায় জড়িয়ে ধরলেন এস ইউ সি আই (সি)-র এক কর্মীকে— আমিও আপনাদের আন্দোলনের শরিক হয়ে সই করেছিলাম। আমার মেয়ে তখন স্কুলে পড়ত, বন্ধুদের দিয়ে সই করিয়েছিল সে-ও। এমনই অনুভূতি আজ পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি মানুষের। দীর্ঘ চলেছে ৪০ বছর ধরে। অবশেষে সরকার মেনে নিল পঞ্চম আর অষ্টম শ্রেণিতে ফিরবে পাশ-ফেল। এই দীর্ঘ সময়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আন্দোলনের চাপে সরকার একের পর এক কমিশন বসিয়েছে। সেই সব কমিশনও এই ক্ষতির কথা অস্বীকার করতে না পেরে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর সুপারিশ করেছে। শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরাও একই দাবি তুলেছেন।

এস ইউ সি আই (সি) দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উন্নততর উপলব্ধি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার দ্বারা অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায় প্রথম থেকেই এই সরকারের পদক্ষেপের আসল উদ্দেশ্য এবং তার ক্ষতির দিক ধরতে পেরে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে।

শুধু যে শিক্ষার বেহাল দশা, তা তো নয়, অসংখ্য সমস্যার ভারে দেশের মানুষ আজ বিপর্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, স্কুল ছাত্রদের ড্রপ আউট, বেকারি, নারী নির্যাতন, চাষির আত্মহত্যা প্রভৃতি সমস্যায় জনজীবন জর্জরিত। অথচ রাজ্যের তৃণমূল সরকার এগুলির সমাধানের জন্য কী করছে? তাদের কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় উৎসব, বিসর্জনের কার্নিভাল, মেলা-খেলা এটাই যেন সরকারের কাজ! সরকারের কাজ কি মদের পাইকারি বিক্রির ব্যবস্থা করা? মদ বেচে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব এসেছে, এটাই নাকি সরকারের সাফল্য? চাষির

দুয়ের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতায় তাঁরা সকলেই যে শরিক!

এস ইউ সি আই (সি) দলের ১৯ বছর ধরে চলেছিল প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফিরিয়ে আনার আন্দোলন। পাশ-ফেল প্রথা ফেরানোর আন্দোলন

ছবি ঃ কৃষ্ণনগরে প্রচার মিছিল

গণআন্দোলনের চাপেই সরকার পাশ-ফেল ফেরাতে বাধ্য হচ্ছে

এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, আজ রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে প্রাথমিক স্তরে তারা পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনছে। সিপিএম সরকারের আমলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে ও পরবর্তীকালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে এ রাজ্যের তো বটেই, সারা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা জনসমর্থনের ভিত্তিতে বছরের পর বছর ধরে নানা পর্যায়ে নানা রূপে আন্দোলন করে আসছি। আজ রাজ্য সরকার এই ঘোষণা করতে বাধ্য হল আন্দোলনের চাপে। ফলে এটা দীর্ঘ গণআন্দোলনেরই জয়। আমাদের দল মনে করে এবং জনগণেরও দাবি, প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করা উচিত। ফলে এই দাবিতে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

এন আর সি বিরোধী

নাগরিক কনভেনশন

৪ নভেম্বর

মৌলালি যুব কেন্দ্র, কলকাতা, বিকাল ৩টা

আসামে ডিটেনশন ক্যাম্প বন্ধের দাবিতে আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)

আসামের বিভিন্ন জেলায় মোট ৬টি ডিটেনশন ক্যাম্পে দীর্ঘ দিন ধরে বন্দি করে রাখা হয়েছে হাজারের বেশি নিরপরাধ মানুষকে। এদের মধ্যে কয়েকজন অন্য দেশের নাগরিক যারা পাসপোর্ট ছাড়া বা পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার অপরাধে বন্দি। তাদের বাদ দিলে বাকি সকলেই ভারতীয় নাগরিক। রাষ্ট্র তাদের বিদেশি সাজিয়ে বন্দি করে রেখেছে।

১৯৯৭ সাল থেকে আসামে উগ্র প্রাদেশিকতা ও জাতিবিদ্বেষী মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত সরকার রাজ্যের ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ গরিব ভারতীয় নাগরিককে 'ডি-ভোটার' বানিয়ে বিদেশি সন্দেহের আবর্তে নিয়ে আসে। এদের বেশির ভাগকেই একতরফা ভাবে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছে।

ইতিহাসে কুখ্যাত হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতো এইসব ডিটেনশন ক্যাম্পে নিরপরাধ গরিব মানুষগুলিকে অবর্ণনীয় পরিবেশে দিনের পর দিন কাটাতে হচ্ছে। ছোট্ট একটি কুঠুরিতে ৪০-৫০ জন মানুষ শ্বাসরোধকারী অবস্থায়, ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে, তিল তিল করে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। কুঠুরির

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিক্ষোভে ফুঁসছে চিলির জনগণ

মালিকদের মুনাফার স্বার্থে ব্যাপক বেসরকারিকরণ, নির্মম শ্রমিক-শোষণ, সামাজিক খাতে সরকারি বরাদ্দ বন্ধ করা এবং পরিণতিতে দেশ জুড়ে ধনী-গরিবে বিপুল আর্থিক বৈষম্যের প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে চিলির জনগণ। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলিতে সেনা-পুলিশের হামলা, কারফিউ উপেক্ষা করে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা সরকারবিরোধী এই বিক্ষোভে গত ২৬ অক্টোবর ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ সামিল হয়েছিলেন প্রতিবাদ মিছিলে (ছবি)। এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১৭ জন বিক্ষোভকারীর, গ্রেপ্তার ৭ হাজার।

১৩ নভেম্বর নবান্ন অভিযান

একের পাতার পর

ফসলের ন্যায্য দাম কোথায়? কে দেখবে তা? ফড়ে মহাজন, বৃহৎ ব্যবসাদার, কর্পোরেট রিটেল চেনের দালালদের খপ্পর থেকে চাষিকে বাঁচিয়ে ধান, পাট, আলু, সরষে, সবজির ন্যায্য দাম পাইয়ে দেওয়া কি সরকারের কাজ নয়? চাষি দাম না পেলেও বাজারে আলু থেকে শুরু করে সমস্ত সবজির দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই। আশাকর্মী, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড ডে মিল কর্মী— কারও খেয়ে-পরে বাঁচার মতো বেতন নেই। এর ব্যবস্থা করা কি সরকারের কাজ নয়? পুলিশের চাকরি থেকে স্কুলকলেজ সহ সমস্ত সরকারি দপ্তরে কাজ চলছে নামমাত্র মাইনের চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়ে। অথচ হাজার হাজার পদ খালি। তাতে স্থায়ী নিয়োগ হবে না কেন? বন্ধ একের পর এক জুটমিল, কলকারখানা। তাতে কাজ হারাচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক। আবার চালু কারখানাতেও মালিক ইচ্ছামতো ছাঁটাই করছে, মজুরি কমাচ্ছে, বেআইনি শর্ত চাপাচ্ছে। চা-বাগান মালিক ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের যোগসাজশে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকরা প্রতারিত হচ্ছে। অনাহারে মৃত্যু চা-বাগানের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠছে। দারিদ্রের জ্বালায় চা-বাগান এলাকা থেকে শত শত শিশু এবং কিশোরী পাচার হয়ে যাচ্ছে। সরকারের কোনও মাথাব্যথা আছে?

মদের প্রসার যাতে বাড়ে তার জন্য রাজ্য সরকার অত্যন্ত সক্রিয়। এর বিষময় ফল বর্তাচ্ছে গ্রাম শহরের অসংখ্য পরিবারে। মদ্যপদের হাতে নারী নির্যাতন বাড়ছে ভয়াবহ হারে। মদ নিষিদ্ধ করে বিহার নারী নির্যাতন, মেয়েদের উপর পারিবারিক নির্যাতন লক্ষণীয় ভাবে কমাতে পেরেছে। সেখানে আজ বাংলা নারী নির্যাতনে দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে। মদ্যপদের হাতে বৃদ্ধা থেকে নিতান্ত শিশুকন্যা ধর্ষিতা হচ্ছে। শহরে গঞ্জে তো বটেই এমনকী গ্রামেও মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।

ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে বিজেপির সাথে হিন্দুত্ববাদের প্রতিযোগিতায় নেমে তৃণমূল সরকার কখনও দুর্গাপুজোর অনুদানে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে, কখনও বিসর্জনের কার্নিভালের মোচ্ছব করছে। শ্মশানের পুরোহিতদের ভাতা দিচ্ছে। অন্যদিকে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের লোভে ইমাম-মোয়াজ্জিমদের ভাতা দিচ্ছে। এর সুবিধা নিচ্ছে বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তি।

চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, নারদ দুর্নীতি তো আছেই, তার সাথে একেবারে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মন্ত্রী স্তর পর্যন্ত পদে পদে কাটমানি আর দুর্নীতিই যেন দস্তুর হয়ে উঠেছে এই বাংলায়। তোলাবাজি আর দাদাগিরি যেন অধিকারে পরিণত হয়েছে শাসকদলের ছোট-বড় নেতার।

অন্য দিকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর বিজেপি সরকারের চাপানো একের পর এক জনবিরোধী নীতিতে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। রেল-ব্যাঙ্ক-টেলিকম-প্রতিরক্ষা-তেল সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিলগ্নিকরণের ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি সরকার। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ এবং এনএমসি বিল। গণআন্দোলন ও মানুষের প্রতিবাদ স্তব্ধ করার মতলবে একদা কংগ্রেসের চালু করা ইউএপিএ আইনের সংস্কারের নামে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতেই যেকোনও মানুষকে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এনআইএ-কে।

একদিকে মানুষের সীমাহীন দুর্দশা, অন্যদিকে সরকারের জনবিরোধী পদক্ষেপগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরকে ভাগ করা নিয়ে উগ্র জাতীয়তার সুর চড়াচ্ছে। এমনকী এনআরসির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাষ্ট্রহীন পরিচয়হীন করে দেওয়ার মতো মারাত্মক বিষয় নিয়েও উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচার তুলতে চাইছে বিজেপি সরকার। এনআরসির ধাক্কায় আসামে ১৯ লক্ষ ভারতীয় আজ নাগরিকত্ব হারিয়ে চরম সংকটে। হাজার হাজার পরিবার এর ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি মানুষের অসহায় মৃত্যু শুরু হয়ে গেছে। এই এনআরসিকেই দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে বিজেপি। যাতে জীবনের প্রকৃত সমস্যা ভুলে দিশাহারা মানুষ ছুটে বেড়ায় শুধু এক রকম কার্ড থেকে আর এক রকম কার্ডের-দলিলের সন্ধানে। একে অপরকে তারা শত্রু ভাববে, ফয়দা লুটবে সরকার। শাসকদল মানুষকে বোঝাতে পারবে, মাথা নিচু করে আমার দাসত্ব মেনে নাও তাহলে সমস্যা থাকবে না। এর সাথেই দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো হচ্ছে। দলিত ও সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা বেড়েই চলেছে।

এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এটাই একমাত্র রাস্তা। কিন্তু দাঁড়াবে কে? ভোটের বাজারের লাভ লোকসানের হিসাব করে নীতি বিসর্জন দেওয়া ভোটবাজ দলগুলি কি এ কাজ পারে? মানুষ জানে, ওরা মাঝে মাঝে আন্দোলন আন্দোলন খেলায় নামে। যার একমাত্র লক্ষ্য কিছু ভোট কবজা করা, নেতাদের মুখগুলিকে টিভি-খবরের কাগজে তুলে ধরা। জনজীবনের এই ভয়াবহ সংকটের বিরুদ্ধে লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা তাদের রাজনীতি নয়। তাই দেশজুড়েই বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবল সম্ভাবনা থাকলেও শুধু ভোটের হিসাবে কার হাত ধরলে সুবিধা এই নিয়ে জল মাপতেই তাদের শক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এস ইউ সি আই (সি)। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই গ্রামে, ব্লকে, মহকুমায় বা জেলা স্তরে নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন চলছেই। স্তরে স্তরে বহু ক্ষেত্রে দাবি আদায় করে ছাড়ছে মানুষের ঐক্যবদ্ধশক্তি। এস ইউ সি আই (সি)-র আন্দোলনই পাশ-ফেল চালুর মতো জয় ছিনিয়ে এনেছে। এমএলএ-এমপির শক্তিতে নয়, জনগণের সংগঠিত শক্তিশালী আন্দোলনের চাপেই যে দাবি আদায় হয়, প্রমাণ হয়েছে সে কথা।

এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই আবার এসেছে নবান্ন এবং উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক। রাজভবনে দেওয়া হবে এনআরসির চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি। এই মিছিলে সামিল হবেন রাজ্যের হাজার হাজার শ্রমিক-চাষি-ছাত্র-যুব-মহিলারা। মিছিলের দৃপ্ত স্লোগান ঘোষণা করবে সেই আন্দোলনের শপথ, যা রুখে দেবে এনআরসির জঘন্য ষড়যন্ত্র। রুখে দেবে মানুষের জীবনের সবকিছু দেশি বিদেশি পুঁজির পায়ে বিকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। মদ-মাদকের নেশায় যৌবনকে ভাসিয়ে দেওয়ার হীন চক্রান্তকে রুখবেই এই আন্দোলনের জোয়ার। আন্দোলনই চেনাবে বেঁচে থাকার সঠিক পথ, চেনাবে জনজীবনের প্রকৃত দাবিকে।

মাঝেরহাট কিংবা টালা ব্রিজ

সরকারি অবহেলারই পরিণাম

এই মুহূর্তে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলির লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁরা রুজি-রোজগারের জন্য হোক, চিকিৎসা করানোর জন্য হোক কিংবা সন্তানকে স্কুলে দেওয়া-নেওয়ার জন্য হোক, নিত্য মূল কলকাতায় আসেন, তাঁরা চরম দুর্ভোগের শিকার। দক্ষিণ শহরতলির ক্ষেত্রে এই দুর্ভোগ চলছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। মাঝেরহাটে নতুন ব্রিজ তৈরির সরকার ঘোষিত সময়সীমা কবেই পেরিয়ে গেছে। অথচ এখনও অনেক কাজ বাকি। কবে কাজ শেষ হবে, কবে ভুক্তভোগী মানুষগুলির সুরাহা মিলবে, কেউ বলতে পারছেন না। আবার সম্প্রতি ব্রিজ বিশেষজ্ঞদের সুপারিশে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী টালা ব্রিজ বন্ধ করে দেওয়ায় কলকাতার উত্তর শহরতলির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ এখন চরম আতান্তরে পড়েছেন। কোন বাস কোথা দিয়ে যাবে, কতদূর যাবে, ব্যাপক যানজট ও প্রায় দশ কিলোমিটার অতিরিক্ত পথ ঘুরে কখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে, তার কোনও হিসেব নেই। আগে পনেরো মিনিটে যে রাস্তাটুকু পার হওয়া যেত, এখন সেখানে লাগছে এক ঘণ্টার উপর। চাকরির হাজিরা ঠিকঠাক রাখতে বাস বদলে বদলে কিংবা অটো ধরে পৌঁছতে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত কড়ি। তাই প্রতিদিন এক ঘণ্টা থেকে দেড়ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে তাঁদের বেরোতে হচ্ছে। বাড়ি ফিরতেও একই সমস্যা।

মাঝের হাট ও টালা ব্রিজটি ছিল কলকাতার দক্ষিণ ও উত্তর শহরতলির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের গেটওয়ে। কলকাতা শহরের বড় হয়ে ওঠার সাথে এই শহরতলি দু'টির সাথে সংযোগের প্রয়োজনে ষাটের দশকের শুরুতে ব্রিজগুলি তৈরি হয়েছিল। তখন যে চাপ ও ভার বহনের কথা ভাবা হয়েছিল, তা থেকে কলকাতা আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। রুটি-রুজির টানে এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ আরও বহু প্রয়োজনে শহরতলির মানুষ বেশি বেশি করে প্রতিদিন শহরমুখী হয়েছে। ব্রিজগুলির উপর দিয়ে গাড়ির চাপ তার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রশাসন নজর দেয়নি। ব্রিজ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমনিতেই পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর ব্রিজের ক্ষয় ধরা শুরু হয়। কেবল উপরিভাগের সংস্কার করতে গিয়ে পিচ ও স্টোনচিপের ভারে ব্রিজকে আরও ভারী করে তোলা হয়েছে। বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়ে শুধু গার্ডারগুলির কংক্রিটের ক্ষতি করেনি, ঢালাইয়ের ইস্পাতের রডগুলিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ব্রিজের গার্ডারগুলি একটি শক্তিশালী লোহার তার দিয়ে আড়াআড়িভাবে বাঁধা থাকে, যাতে ব্রিজের ভার সমস্ত গার্ডারগুলির উপর সমভাবে পড়ে। প্রযুক্তির পরিভাষায় একে বলে 'ক্রস প্রি-স্ট্রেসড ডেক', সেই লোহার তারেও মরচে ধরেছে। ফলে গার্ডারগুলির উপর অসম চাপ বেড়ে সেতুর ভার বহন ক্ষমতাকে কমিয়ে এনেছে। সেতু বিশেষজ্ঞের মতে ২০০০ সালের পর কংক্রিটের প্রযুক্তিতে বড়সড় পরিবর্তন এসেছিল। ব্রিজের কাঠামোয় কত পুরু কংক্রিটের ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে নতুন কোড বেরিয়েছিল। প্রযুক্তির এই অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার এই ব্রিজগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সংস্কার করার প্রয়োজন ছিল। পূর্বতন সিপিএম সরকার কিংবা বর্তমান তৃণমূল সরকার কেউই এইসব ব্রিজ সংস্কারের বা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকাই নেয়নি। এই ব্রিজের তলা দিয়ে গিয়েছে টালাট্যাঙ্ক থেকে পানীয় জলের পাইপ, বিদ্যুতের কেবল, নিকাশির পাইপ এমনকি পরিত্যক্ত গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সার্ভিসের পাইপ লাইন। ব্রিজ ভাঙার আগে এগুলির বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ব্রিজের কাঠামোগত দুর্বলতা কী করে সরকারের বা প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গেল?

ওরা ঘোষণা করেছিল, কলকাতাকে তিলোত্তমা বানাবে। বানাবে লন্ডন। কিন্তু শহরে একের পর এক ব্রিজ ধসে পড়া, উড়ালপুল ভেঙে পড়া, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, সামান্য বৃষ্টিতেই কলকাতা ডুবে যাওয়া, মশার উৎপাত, ডেঙ্গুতে মৃত্যু ইত্যাদি রোধ করার দায়িত্বে সরকারের যে বা যারাই থাকুক প্রকৃতপক্ষে নাগরিক পরিষেবা তলানিতে। তিলোত্তমার বা লন্ডনের ঘোষণা বাস্তবে ভঙ্গি দিয়ে ভোলানোর ছল। নাগরিক আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগে নাগরিক জীবন নিয়ে এমন উদাসীনতা দেখাতে পারছে সরকার।

বাঙ্গালোরে ভ্যান-ড্রাইভারদের কনভেনশন

২৩ অক্টোবর বাঙ্গালোর শহরে অনুষ্ঠিত হয় ভ্যান-ড্রাইভাদের কনভেনশন। বিপুল সংখ্যক ভ্যান-ড্রাইভারের উপস্থিতিতে কনভেনশনে ভাষণ দেন প্রধান বক্তা এ আই ইউ টি ইউ সি-র কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে সোমশেখর। প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। ভ্যান-ড্রাইভারদের সংগঠন সহ আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংগঠনের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

তমলুকে বুদ্ধিজীবী কনভেনশন

পুর্ব মেদিনীপুরের তমলুক শহরে ২০ অক্টোবর গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও মৌলবাদ, এনআরসি, কাশ্মীর সমস্যা, বিজ্ঞান বিরোধী যুক্তিহীন অন্ধ মানসিকতা প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে নাগরিক কনভেনশন হয়। শতাধিক চিকিৎসক, শিক্ষক-আইনজীবী-কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা করেন ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া, শিক্ষক রণজিৎ জানা, আবহাওয়াবিদ অশোককুমার হাজরা, আইনজীবী ময়ুন্ময় অধিকারী, সৈয়দ খালেকুজ্জমান, শিক্ষিকা পদ্মাবতী সামন্ত, ব্যাঙ্ক আধিকারিক সুশীল দাস, আশুতোষ মুখার্জী, চুনিলাল তুঙ্গ প্রমুখ। শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের তমলুক মহকুমা শাখা সর্বসম্মতিতে গঠিত হয়।

করপোরেটদের কর ছাড় দিলেই কি চাহিদার সমস্যা মিটবে?

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০ সেপ্টেম্বর করপোরেট কর ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করেছেন। একে 'ঐতিহাসিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

এতদিন বড় সংস্থার (যাদের ব্যবসা বছরে ৪০০ কোটি টাকার বেশি) করপোরেট কর ছিল ৩০ শতাংশ। সারচার্জ ও সেস মিলিয়ে ৩৪.৯৪ শতাংশ দিতে হত। এখন কর ২২ শতাংশে নামায় কার্যক্ষেত্রে দিতে হবে ২৫.১৭ শতাংশ। যার অর্থ, কর কমেছে ১০ শতাংশ। নতুন কলকারখানা খুলতে চাওয়া সংস্থার জন্যও করপোরেট করের হার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে আনা হল। সেস ও সারচার্জ নিয়ে এই হার ২৯.১২ শতাংশ থেকে কমে হল ১৭.০১ শতাংশ। বাজেটে শেয়ার বাজারে বিদেশি সংস্থাগুলির মুনাফার উপরে বাড়তি সারচার্জ যুক্ত করা হয়েছিল। তার কিছুটা অংশ আগেই প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সরকার। সাম্প্রতিক কর ছাড়ের ঘোষণায় আরও একদফা কর ছাড় বা তার উপর বাড়তি সারচার্জ প্রত্যাহার করা হল।

সব মিলিয়ে শিল্পমন্ত্রীর ঘোষণা করপোরেট গোষ্ঠী বা শিল্পমহলের প্রত্যাশা ছাপিয়ে গিয়েছে। কিছু দিন ধরে তারা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উপরে বারে বারে চাপ দিয়ে ১ লক্ষ কোটি টাকার 'স্টিমুলাস' চেয়েছিল। অর্থমন্ত্রী তাদের ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকার স্টিমুলাস দিলেন। বোঝা যাচ্ছে সরকার করপোরেট বা শিল্পমহলের কতখানি বাধ্য। বিপরীতে জনগণের স্বার্থে কোনও দাবি উঠলে তারা আশ্চর্য রকমভাবে বধির হয়ে যায়। স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত শিল্পমহল ও বণিক সভাগুলি একে 'প্রাক দেওয়ালির রোশনাই' বলে উদ্বাহু হয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে।

এরই মধ্যে অর্থমন্ত্রী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তিকরণের ঘোষণা করেছেন। এর দ্বারা সরকার ব্যাঙ্কগুলিতে বেসরকারিকরণের ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। করপোরেটদের চাপেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত। এর ফলে বড় ঋণ পাওয়ার সুযোগ তাদের সহজলভ্য হবে। দেশের অর্থনীতির মন্দাজনিত গভীর সংকট ও করুণ অবস্থা দেখে শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে সরকারের এই মরিয়া পদক্ষেপ। কারণ কিছুদিন ধরে শিল্পমহল সরকারের সমালোচনায় সোচ্চার হচ্ছিল।

অথচ সারা দেশের চিত্রটা কী? আজ বেশিরভাগ মানুষের চিন্তা তাঁরা বাঁচবেন কী করে। গোটা দেশে শিল্প ধুঁকছে, নতুন লগ্নি হচ্ছে না। বিদেশি লগ্নি তলানিতে। কৃষির অবস্থা শোচনীয়, ফসলের দাম নেই, ঋণের দায়ে লক্ষ লক্ষ চাষি আত্মহত্যা করছে,পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। নোট বাতিল ও জিএসটির ধাক্কায় ছোট-বড়-মাঝারি কলকারখানার নাভিশ্বাস উঠছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, যার সংখ্যা বিগত দু'বছরে দু'কোটি। বেকারির হার সর্বোচ্চ, কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি এক শতাংশের কম, কৃষিতে তা দুই শতাংশের কম। ক্ষুধা সূচকে ভারতের জায়গা হয়েছে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের নিচে। চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে আর্থিক বৃদ্ধির হার পাঁচ শতাংশে নেমে এসেছে। এক গভীর মন্দার অন্ধকার নেমে এসেছে মানুষের জীবনে।

এক কথায় বর্তমান চরম আর্থিক বৈষম্য এই মন্দার কারণ, যা দ্রুত হারে বাড়ছে। দেশে ৬২ শতাংশ মানুষ অত্যন্ত গরিব, দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে, ৬৭ কোটি ভারতীয় মাত্র এক শতাংশ সম্পদের মালিক, ২৩ কোটি মানুষ আধপেটা খাবারও জোটাতে পারে না। প্রতিদিন ৭ হাজার মানুষ অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। প্রতি ঘণ্টায় ৫ জন শ্রমজীবী মানুষ আত্মহত্যা করে। আর্থিক অসাম্য দ্রুত হারে বাড়ছে।

দেশের কল-কারখানা-খনি-বাগিচা-কৃষিজমি নিয়ে অর্থনীতির কর্মকাণ্ড। এ সবের যা উৎপাদন ক্ষমতা তাকেই কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কল-কারখানার ৫০-৬০ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা অলস হয়ে পড়ছে। যা-ও চলছে তা ঢিমে তালে, শিফট বন্ধ হচ্ছে, কোথাও সপ্তাহে ২-৩ দিন উৎপাদন চালু রেখে বাদবাকি দিন উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। উৎপাদনের হার কমছে।

অসাম্য বা বৈষম্য যত বাড়ছে, উৎপাদনের হার তত কমছে। কারণ সকল শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমে চলেছে। এই ক্রয়ক্ষমতার ওপরই দেশের বাজার নির্ভর করে। আবার রফতানির বাজারও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে।

ফলে লগ্নিকারীরা লাভের আশা দেখতে না পেয়ে যতটুকু লগ্নি করছিল তার পরিমাণও আপেক্ষিক অর্থে কমিয়ে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে অর্থনীতির বৃদ্ধির হার কমছে।

মুষ্টিমেয় লগ্নিকারী করপোরেটদের কর ছাড় দিয়ে বা 'স্টিমুলাস' দিয়ে, ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ঋণের জোগানের সুযোগ বাড়িয়ে, সরকারি অর্ডার বাড়িয়ে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রতিরক্ষা সহ নানা সরকারি সংস্থায় কিনে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে বিজেপি সরকার খাতায়-কলমে উৎপাদন অনেক বেড়েছে বলে দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু গোঁজামিলের এই হিসাবে আর্থিক বৈষম্য ঢাকা দেওয়া যায় না। বরং তাতে আর্থিক অসাম্য আরও বাড়ে, মন্দা গভীরতর হয়। দেশের মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ে না। আর্থিক সুযোগ-সুবিধা উপরতলার শিল্পপতিদের পাইয়ে দেওয়া আসলে অনেকটা গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মতো। এতে নিচের তলার মানুষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। দেশের আর্থিক হাল ক্রমশ খারাপ হচ্ছে এই অসাম্যের জন্য। গভীর হচ্ছে অর্থনীতির মন্দাজনিত বিপর্যয়।

রাজস্ব ক্ষতি করে শুধুমাত্র করপোরেটদের কর ছাড় দিয়ে এই এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার কোটি টাকা সরকার যদি পরিকাঠামোর উন্নতিতে ব্যয় করতে পারত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে ব্যয় বাড়াত, কৃষিতে ব্যবহার্য সার-বীজ-কীটনাশক প্রভৃতিতে 'স্টিমুলাস' দিত, ফসলের সংগ্রহমূল্য বাড়াত, পেট্রল-ডিজেলে অতিরিক্ত সেস ও সারচার্জ তুলে নিত, তবে সাধারণ মানুষের জীবনে কিছুটা সুরাহা হত। কর্মসংস্থান হত। অর্থনীতির চাকাও ঘুরত।

দু-একটি বিপর্যয়ের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়। মন্দা যখন মহামন্দা রূপে গোটা দুনিয়া, বিশেষত ইউরোপের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল— সেটা ছিল ১৯২৯ সালের 'দ্য গ্রেট ডিপ্রেসন' আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় কালের কয়েকটা বছর। উন্নত দেশগুলিতে অর্থনীতির একটি শব্দ তখন তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উঠে এসেছিল। শব্দটি হল 'ডেফিসিট ফিনান্সিং'। অর্থাৎ বাজেট ঘাটতি বা রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়ে চাহিদা বৃদ্ধি করা। নানা অর্থনৈতিক কাজ বাড়িয়ে তোলা, যাতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। পরোক্ষ কর কমিয়ে দেওয়া যাতে মানুষের পকেটে খরচ করবার মতো টাকার পরিমাণ বাড়ে। খরচ বাড়লে মানুষের হাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আয়ের পরিমাণ বাড়বে। এতে অর্থনীতির চাকা ঘুরতে থাকবে। টাকা হাতে এলে মানুষ পণ্য ও পরিষেবার পিছনে খরচ করবে, এতে উৎপাদনের পরিমাণও বাড়বে। অর্থনীতির ভাষায় এর পোশাকি নাম 'কেইনসিয়ান মাল্টিপ্লায়ার প্রসেস'। আপেক্ষিক অর্থে সেই সময়কালে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার, অর্থনীতির স্বাস্থ্য ফেরানোর যতটুকু সুযোগ ছিল, সর্বোচ্চ মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত জরাগ্রস্ত মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেটুকুও আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানা অর্থনৈতিক জোট, ডব্লিউটিও, আইএমএফ প্রভৃতি সংস্থা কর-দর-বাজেট ঘাটতি, আমদানি ও রপ্তানি প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। এ নিয়ে কড়া আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধ আছে। এ ছাড়াও দেশের আর্থিক নিয়মানুসারে 'ফিসক্যাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট (এফআরবিএম) অ্যাক্ট'-এর ফলে রাজকোষ ঘাটতি বাড়ানোর ব্যাপারেও সমস্যা আছে।

এর ফলে ৫-৬ শতাংশ হারে জাতীয় আয় যতটুকু বাড়ছে তার পুরোটাই ঢুকেছে অল্প সংখ্যক লোকের পকেটে। ধনীরা ধনীতর হচ্ছে, দরিদ্ররা দরিদ্রতর। সরকারকে যদি এফআরবিএম আইন মেনেই চলতে হয়, তবে করপোরেট কর-সেস-সারচার্জ—এইসব ছাড় দেওয়ার ফলে যে রাজস্ব ক্ষতি হয়, এই ক্ষতিটা পূরণ হবে কী করে? এখনও পর্যন্ত পরিকাঠামো বা সামাজিক ক্ষেত্রে যতটুকু ব্যয় হয়, তার পরিমাণ আরও কমিয়ে ক্ষতিটা পূরণ করবে সরকার। এর ফলে ক্রমাগত বাড়বে কর-দর-বেকারি-অনশন-আত্মহত্যার মিছিল। অন্য দিকে চোখ ধাঁধানো আগাম 'দেওয়ালির রোশনাই'য়ের মধ্যে আপামর সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসবে অনিশ্চয়তার গাঢ় অন্ধকার।

বিড়ি শ্রমিকদের রাজ্য সম্মেলন

২২ অক্টোবর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার চতুর্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার ভারতসভা হলে (ছবি)। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে দেড় শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিরা বলেন, 'ভারতবর্ষের ১ কোটির বেশি বিড়ি শ্রমিকের সাথে পশ্চিমবঙ্গের ২৩ লক্ষাধিক বিড়ি শ্রমিক চরম সংকটে। তাঁরা মালিক, ঠিকাদার ও সরকারের ত্রিমুখী শোষণ অত্যাচারে জর্জরিত। সরকারি ন্যূনতম মজুরি হাজার বিড়ি বাঁধার জন্য কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ২৬২.০৩ টাকা, হাওড়া-হুগলিতে ২৩৯.৯৬ টাকা, বাকি জেলায় ২৫৪.৯৯ টাকা। কিন্তু বাস্তবে শ্রমিকরা পান ৭০ থেকে ১৫২ টাকা। এছাড়া মালিক ও ঠিকাদাররা অন্যায়ভাবে পাতা ও তামাকের দাম কেটে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি আরও কমিয়ে দেয়। বিগত ও বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারই বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি। সম্মেলন থেকে দাবি ওঠে, সারা দেশে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য একই

মজুরি চালু করতে হবে।

১৯৭৭ সাল থেকে বিড়ি শ্রমিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় এলেও পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ (প্রায় ১৯ লক্ষ) বিড়ি শ্রমিকের পিএফ চালু হয়নি। ফলে তারা পেনশন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। অনেক আন্দোলনের ফলে ১৯৭৬ সালে বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ আইন লোকসভায় পাশ হয় এবং ১৯৭৮ সাল থেকে তা কার্যকরী হয়। এই প্রকল্পের কোনও সুযোগ পেতে হলে প্রয়োজন সরকারি বিড়ি শ্রমিক পরিচয়পত্রের। এ রাজ্যে এখনও ৮ লক্ষাধিক বিড়ি শ্রমিক সরকারি পরিচয়পত্র পাননি। কল্যাণ প্রকল্প চালু হওয়ার পর যতটুকু সুযোগ বিড়ি শ্রমিকরা পেতেন আজ তাও তাঁরা পাচ্ছেন না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ নির্মাণ প্রকল্প থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বিভিন্ন প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবে বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ দপ্তরের গুরুত্ব লঘু করে দেওয়া হচ্ছে। বিড়ি শিল্প থেকে জিএসটি-র মাধ্যমে ওঠা টাকার খুবই সামান্য পরিমাণ কল্যাণ প্রকল্পে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার কিছুই প্রায় দিচ্ছে না। সম্মেলনে দাবি ওঠে, বিড়ি শিল্প থেকে জিএসটি-র মাধ্যমে ওঠা টাকার ৫০ শতাংশ টাকা বিড়ি শ্রমিক কল্যাণে খরচ করতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড মধুসূদন বেরা। সম্মেলন থেকে কমরেড অশোক দাসকে সভাপতি, কমরেড আনিসুল আম্বিয়াকে সম্পাদক করে ৩৭ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। প্রতিনিধিরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে জেলায় জেলায় ফিরে যান।

কিশোর শিবির ও ফুটবল প্রতিযোগিতা

কিশোর শিবির ঃ ২৩-২৪ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কমসোমলের জেলা কিশোর শিবির অনুষ্ঠিত হয় ঘুটিয়ারি শরিফের প্রগতি নাট্যমঞ্চ হলে। এতে ৯৫ জন অংশগ্রহণ করে। শিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বিশ্বনাথ সরদার, কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী। শিবিরে খেলাধূলা, পিটি-প্যারেড, ব্যান্ড প্রশিক্ষণ হয়। এছাড়া মূকাভিনয় ও সিনেমা দেখানো হয়।

ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২২ অক্টোবর পুরুলিয়া জেলা কমসোমলের উদ্যোগে খৈরী-পিহীঁড়া হাইস্কুল মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার কমসোমল ব্রিগেড থেকে ৮টি দল এতে অংশ নেয়। বিজয়ী হয় হরিটাঁড় ফুটবল দল। উপস্থিত ছিলেন কমসোমলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মধুমিতা সাঁতরা এবং এসইউসিআই(সি)-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রঙ্গলাল কুমার।

মঙ্গলকোটে বিডিও বিক্ষোভ

ব্লক স্তরের পরিবর্তে পঞ্চায়েত ভিত্তিক শিবির করে ডিজিটাল রেশন কার্ডের কাজ করতে হবে, ডিজিটাল কার্ড না পাওয়া পর্যন্ত পুরনো কার্ডেই রেশন দিতে হবে, কোনও অজুহাতেই এনআরসি-র নামে বৈধ নাগরিকদের বিদেশি তকমা দেওয়া চলবে না প্রভৃতি দাবিতে ১৮ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানা কমিটি বিডিও দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়।

উত্তর দিনাজপুরে মোটরভ্যান চালক সম্মেলন

কোনও অজুহাতেই মোটরভ্যান চালানো বন্ধ করা চলবে না, ভ্যানের স্থায়ী সরকারি লাইসেন্স, দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালু এবং চালকদের পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতির দাবিতে ২২ অক্টোবর রায়গঞ্জে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক চালক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সনাতন দত্ত। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অংশুধর মণ্ডল। গোপাল দেবনাথকে সম্পাদক ও তপন দাসকে সভাপতি করে ৩৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের মথুরাপুর ব্লক সম্মেলন

গ্রামীণ চিকিৎসকদের সংগঠন পিএএমপিএআই-এর মথুরাপুর ব্লক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঘোড়াদলে, ১৯ অক্টোবর। উপস্থিত গ্রামীণ চিকিৎসকরা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি ও উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরির দাবি তোলেন। প্রধান বক্তা ডাঃ নীলরতন নাইয়া দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজন তুলে ধরেন।

সম্মেলন থেকে সুদর্শন নাইয়াকে সম্পাদক ও অলোক বৈদ্যকে সভাপতি করে ব্লক কমিটি তৈরি হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সত্যব্রত হাজরা ও সভাপতি স্বপন পালিত।

চাঁচলে গ্রামবাসীদের আন্দোলনে বিশাল জয়

দীর্ঘ ৯ মাস ধরে লাগাতার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য জয় হল মালদা জেলার চাঁচলের গ্রামবাসীদের। চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুরে ১৩২ কেভি বিদ্যুতের সাবস্টেশন তৈরি হবে। এর জন্য চাঁচল-১ এবং হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকের আটটি অঞ্চলের বাস্তু ও কৃষিজমির উপর দিয়ে হাইটেনশন তার ও টাওয়ার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানি (ডব্লিউবিএসইটিসিএল) যে এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে তারা জমির মালিকের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই পুলিশি হুমকি, শাসক দলের চোখ রাঙানিকে হাতিয়ার করে একের পর এক জমিতে টাওয়ার বসানোর অনুমতি কার্যত কেড়ে নিচ্ছিল। নো অবজেকশন সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। অ্যাবেকার স্থানীয় কর্মীরা গ্রামবাসীদের নিয়ে এর প্রতিবাদ করেন। ফলে এজেন্সি কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। গ্রামের পর গ্রাম প্রচার, বৈঠক করে বহু পরিশ্রমে গড়ে ওঠে 'বাস্তু ও কৃষিজমি বাঁচাও চাঁচল মহকুমা কমিটি'। কমিটির আহ্বানে ২১ অক্টোবর চাঁচল মহকুমা শাসকের কাছে প্রায় দেড়শতাধিক মানুষের বিক্ষোভ ও গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

স্মারকলিপিতে প্রশ্ন তোলা হয়—আধুনিক জীবনযাত্রার মানের অন্যতম মাধ্যম বিদ্যুৎ, কিন্তু তা বলে উন্নয়নের দায়ভার গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের বহন করতে হবে কেন? দাবি তোলা হয়, কম ক্ষতি হয় এমন বিকল্প এলাকা নির্বাচন করা অথবা জমি ও সম্পত্তির সুরক্ষা এবং তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ জনসমক্ষে ঘোষণা করতে হবে।

আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ চাষের জমিতে এ-টাইপ থেকে ডি-টাইপ টাওয়ারের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার থেকে ৫৮ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। বাস্তু জমির ক্ষতিপূরণ আরও বিবেচনা করা হবে। কিন্তু হাইটেনশন তারের নিচের জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় নেতৃত্ব ঘোষণা করেন আন্দোলনকে আরও উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত বিশ্বাস, চাঁচল শাখা কমিটির সম্পাদক রকিব হোসেন, বাস্তু ও কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রাজিউল ইসলাম (রাজিব)। কমিটির সভাপতি মুসারফ হোসেনের নেতৃত্বে মহম্মদ হান্নান আলি, মহম্মদ মোকরম আলি, রাহানুল হক, মাসুদ আলম ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভ পরিচালনা করেন অ্যাবেকা মালদা জেলার বিশিষ্ট সংগঠক অংশুধর মণ্ডল।

দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি বিদ্যুৎ আধিকারিকদের

বাঁকুড়া শহরের ডিওসি হলে ২০ সেপ্টেম্বর অ্যাবেকার বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে বিদ্যুৎ দপ্তরের জেলা স্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একটি সভা হয়। সভা পরিচালনা করেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী। জেলার খরাবিধ্বস্ত মানুষের বিদ্যুৎ মাশুল কমানো, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সহ ১৮ দফা দাবি নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার পর আধিকারিকদের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। আধিকারিকরা সাবস্টেশন চালু, ট্রান্সফর্মার সমস্যা মেটানো সহ বেশ কয়েকটি দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জগন্নাথ দাস সহ অমিয় গোস্বামী, স্বপন নাগ, নিমাই দে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মুরারইয়ে দাবি আদায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের

পোড়া ট্রান্সফরমার দীর্ঘদিন ধরেই পড়ে থাকছে, পাল্টানো হচ্ছে না, মিটার থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অন্যায়ভাবে হাজার হাজার টাকায় ভুয়ো বিল মেটাতে বাধ্য করা হচ্ছে, প্রতিবাদ করতে গেলে বিদ্যুৎ দপ্তর কর্তৃপক্ষ দুর্ব্যবহার করে গ্রাহকদের অফিস থেকে বের করে দিচ্ছে, মিথ্যা কেস দিয়ে হয়রান করছে। সমস্যা জর্জরিত গ্রাহকদের নিয়ে কথা বলতে বা ডেপুটেশন দিতে গেলে স্টেশন ম্যানেজারকে পাওয়া যায় না, পেলেও চলতে থাকে গড়িমসি। এই অবস্থায় ২১ অক্টোবর বীরভূমের মুরারইয়ে বিক্ষোভের কর্মসূচি ঘোষণা করে বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি অ্যাবেকা।

স্টেশন ম্যানেজার প্রথমে উপস্থিত থাকার কথা জানালেও ২০ তারিখ ফোন করে দিন পরিবর্তন করতে বলেন। নেতৃত্ব অনড় থাকায় পরে পুলিশ দিয়ে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু কর্মসূচি অপরিবর্তিত থাকে এবং পরদিন সকাল থেকেই গ্রাহকদের জমায়েত দেখে স্টেশন ম্যানেজার আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। প্রচুর পুলিশ এলাকা ঘিরে রাখে।

গ্রাহকদের অনমনীয় মনোভাবের সামনে স্টেশন ম্যানেজার দাবি মানতে বাধ্য হন। ৩টি বিকল ট্রান্সফরমারের মধ্যে দু'টি তখনই পরিবর্তন করার এবং অ্যাবেকার দেওয়া তালিকা অনুযায়ী পাঠানো সমস্ত অন্যায় বিল আগামী এক মাসের মধ্যে সংশোধন করে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। দাবি আদায়ে অ্যাবেকার সংগ্রামী ভূমিকা গ্রাহকদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

আম্বানি-আদানিদের ‘আচ্ছে দিন’

বিপুল হারে দেশে বাড়ছে বৈষম্য

প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের মতো ভারতেও আর্থিক বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। একদিকে ধনী—মালিক শ্রেণির প্রতিনিধি যারা তাদের ধনসম্পদ ফুলে ফেঁপে উঠছে। অন্য দিকে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁরা প্রতিদিন পরিণত হচ্ছেন হতদরিদ্রে। তা হলে দেশে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ তৈরি হচ্ছে কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের কঠোর পরিশ্রমে তা যাচ্ছে কোথায়?

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পত্রিকা ‘ফোবর্স’ ধনীতম ভারতীয় ১০০ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। যেখানে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক মুকেশ আম্বানি, যার মোট সম্পদের পরিমাণ বর্তমানে ভারতীয় মুদ্রায় ৩.৭ লক্ষ কোটি টাকা, আছেন এক নম্বরে। গত ৫ বছরে যার সম্পদ বেড়েছে ১১৮ শতাংশ। এই তালিকায় দ্বিতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানি। যার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১.১৩ লক্ষ কোটি টাকা। যিনি গত বছরের তালিকা থেকে আট ধাপ উঠে এসে এবার ২ নম্বর স্থানে। আদানির সম্পদ গত ৫ বছরে বেড়েছে ১২১ শতাংশ। এঁদের ঠিক পিছনেই রয়েছেন যথাক্রমে অশোক লেল্যান্ডের মালিক হিন্দুজা ভাইয়েরা (মোট সম্পদ ঃ ১.১২ লক্ষ কোটি টাকা), সাপুরজি পালোনজি গ্রুপের মালিক পালোনজি মিস্ত্রী (মোট সম্পদ ঃ ১০.৭৯ হাজার কোটি টাকা)। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের মালিক উদয় কোটাক মোট সম্পদ ১০.৬৫ কোটি টাকা।

বলা বাহুল্য, ‘ফোবর্স’ পত্রিকার এই সদ্য প্রকাশিত তালিকা কতগুলো নির্মম সত্যকে একই সাথে প্রকাশ করে দিয়েছে। ধনীতম ভারতীয়দের প্রথম ১০০ জনের মোট সম্পদ ২০১৪ সালের ২৫ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৩২ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ৩১ শতাংশ। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) ৬ শতাংশের মালিক এই ১০০ জন ধনী। আরেকটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। গত ১২ বছর ধরেই দেশের ধনীতম ভারতীয়ের শীর্ষস্থানটি দখলে রেখেছেন বিজেপি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি। মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকে যার সম্পদ বেড়েছে ১১৮ শতাংশ। অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি। অপর মোদি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানি, যার মোদি ঘনিষ্ঠতা মোদি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময় থেকেই সুবিদিত, তারও সম্পদ বেড়েছে ১২১ শতাংশ। মোদি আমলে অন্যান্য শিল্পপতিদের সাথেও বিজেপি-আরএসএসের ঘনিষ্ঠতা কারও অজানা নেই। বুঝতে অসুবিধা হয় না, ‘আচ্ছে দিন আনেওয়ালে হ্যায়’ বলতে প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রাক্কালে মোদিজি ঠিক কাদের ‘আচ্ছে দিন’ আনার কথা বলেছিলেন!

তথ্য থেকে স্পষ্ট শ্রমিক-কৃষক সহ শ্রমজীবী মানুষের চরম দারিদ্রের কারণ, তারা যে সম্পদ তৈরি করে চলেছেন, তা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করছে এই মালিকরা। পুঁজিবাদী নীতির কারণেই মালিকরা এই নীতিহীন শোষণ চালাতে পারে। সরকারগুলিও মালিকদেরই পাশে দাঁড়ায়। তাই দেশজুড়ে যখন কৃষকদের আত্মহত্যার স্রোত বইছে, শ্রমিকরা সপরিবারে আত্মহত্যা করছেন, তখন মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের সম্পদের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। দেশের ৭৩ শতাংশ সম্পদের মালিকানা কুক্ষিগত হয়েছে মাত্র ১ শতাংশের হাতে। স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস, বাম নামধারী সিপিএম, বা তৃণমূলের মতো আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলো প্রত্যেকটির চরম মালিকঘেঁষা নীতির ফলেই আর্থিক বৈষম্য এমন হু হু করে বেড়ে চলেছে। দেশে বেকারির জ্বালায় বা অনাহারে মৃত্যু বাড়ছে প্রবলভাবে। ভিটে মাটি হারাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। দেশের নেতা-মন্ত্রীরা উন্নয়নের কথা বলে, উগ্র প্রাদেশিকতায়, ধর্মান্ধতায়, উগ্র জাতীয়তাবাদের মোহে যতই দেশের মানুষকে ভোলানোর চেষ্টা করুন না কেন, শোষিত মানুষ বেশিদিন আর এই বৈষম্য মেনে নেবেন না। সেই দিন আর দূরে নেই, যেদিন দেশের লক্ষ কোটি জনতা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ে সমস্ত অন্ধতা মোহের জাল ছিঁড়ে সঠিক আদর্শ ভিত্তিক লড়াইয়ে সামিল হবেন।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

নোট বাতিলে বেড়েছে জাল নোট

সারা দেশ আশা করছিল, ৫০০ এবং হাজার টাকার নোট বাতিলের ফলে জাল নোটের রমরমা কমবে। কিন্তু ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য বলছে, ২০১৭ সালে প্রায় ২৮ কোটি টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যা তার আগের বছরের প্রায় দ্বিগুণ। ২০১৬-য় দেশে প্রায় ১৫.৯ কোটি টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এনসিআরবি-র তথ্য অনুযায়ী নোট বাতিলের পরে জাল নোট কমেনি, বরং বেড়েছে।

রিপোর্ট জানাচ্ছে, নোট বাতিলের পরে যে-দু’হাজার টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়েছিল, ২০১৭ সালে প্রায় ৭৫ হাজারটি সেই নোট জাল হয়েছে। বাতিল হয়ে যাওয়া হাজার টাকার নোটও জাল হয়েছে ওই বছর। গোটা দেশে বাতিল এক হাজার টাকার নোট জালের সংখ্যা ৬৫, ৭৩১। একই ভাবে ৫০০ টাকার নতুন নোটের তুলনায় বেশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২০১৬ সালের নভেম্বরে বাতিল হয়ে যাওয়া ৫০০ টাকার পুরনো নোট।

২০১৭ সালে সব চেয়ে বেশি জাল নোট (৮০,৫১৯ টি, টাকার অঙ্কে ন’ কোটি) বাজেয়াপ্ত হয়েছে গুজরাটে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি (বাজেয়াপ্ত ছ’কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার জাল নোট)। ষষ্ঠ বাংলা। ২০১৬ সালে বাংলায় প্রায় ২৩ কোটি জাল টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ২০১৭-য় তা কমে হয়েছে ১৯ কোটি। কেন্দ্রের দাবি ছিল, নোট বাতিলের ফলে কালো টাকা এবং জাল নোটের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা যাবে। কোণঠাসা করা যাবে জঙ্গিদেরও। কিন্তু ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড বুরোর তথ্য বলছে, কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি।

আত্মঘাতী কত চাষি, হিসেব দিল না কেন্দ্র

দেশে কত জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন, এ বারও সেই তথ্য প্রকাশ করল না কেন্দ্র। ‘ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো’র প্রকাশিত রিপোর্টেও চাষিদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান নেই।

২০১৫ থেকে এই রিপোর্টে চাষিদের আত্মহত্যার তথ্য থাকছে না। অভিযোগ, ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। এ বার ২০১৭-এর মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার তথ্যের অধিকার আইনে জানিয়েছে, তাদের আমলে গত ৪ বছরে দিনে গড়ে ৮ জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন। ২০১৫ থেকে ২০১৮— চার বছরে ১২,০২১ জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ২৪.১০.’১৯)

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সম্মেলন

২০ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার বহড়ু গার্লস হাইস্কুলে প্রায় ৭০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের ষষ্ঠ সম্মেলন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর প্রায় ১৫ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত, রাজ্য কমিটির সদস্য জলি চ্যাটার্জী আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য জ্ঞানানন্দ রায়। সম্মেলনে তপতী ভট্টাচার্যকে সেম্পাদিকা ও সেরিনা মিদ্দেকে সভানেত্রী নির্বাচিত করে ৫৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ডিটেনশন ক্যাম্প বন্ধের দাবিতে আন্দোলন

একের পাতার পর

মেঝেতেই তাদের শুতে হয়। খাবার বলতে সামান্য ডাল-ভাত, সেও মানুষের খাদ্যের অনুপযুক্ত। এই কারণে অনেকেই নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদের চিকিৎসারও কোনও ব্যবস্থা নেই। অনেকেই এই বীভৎস যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে মানসিক রোগের শিকার হয়ে যাচ্ছেন। উপযুক্ত খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে শুরু হয়েছে কার্যত মৃত্যুমিছিল। ইতিমধ্যেই ২৮ জন মারা গেছেন।

১৩ অক্টোবর শোণিতপুর জেলার অলিশিঙ্গা গ্রামের দুলাল চন্দ্র পাল (৬৪) রাষ্ট্রের এই চক্রান্তের বলি হয়েছেন। ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ‘ফরেনার্স ট্রাইবুনাল’ ২০১৭ সালের অক্টোবরে তাঁকে একতরফা ভাবে ‘বিদেশি’ ঘোষণা করে। নিজের বাড়িতে মাটির বাসন তৈরি করে কোনরকমে সংসার চালাতেন হতদরিদ্র দুলালবাবু। ট্রাইবুনালে তাঁর নামে মামলা হওয়ার পর টাকার অভাবে দীর্ঘ দিন তিনি মামলা চালাতে পারেননি। তাছাড়া, যেসব নথিপত্র তাঁর নেই বা একজন দরিদ্র মানুষের থাকার কথাও নয়, ট্রাইবুনাল সেইসব নথিপত্র দেখানোর দাবি করে। তিন ছেলে ও স্ত্রী-কে নিয়ে সংসার চালাতেই যিনি ক্লান্ত তিনি এমন সব নথি পাবেন কোথায়? ফলে, বাপ-ঠাকুরদার ভিটেতেই দুলালবাবুর গায়ে সরকার ‘বিদেশি’ তকমা লাগিয়ে দেয়। তারপর থেকে প্রৌঢ় দুলালবাবুর ঠিকানা হয়ে যায় তেজপুরের ডিটেনশন ক্যাম্প।

দীর্ঘ দিন ক্যাম্পে অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম তাঁকে তেজপুর হাসপাতালে এবং পরে গুয়াহাটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসার জন্য তত দিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ১৮ অক্টোবর তিনি মারা যান। সরকার তাঁর মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিতে চাইলে দুলালবাবুর ছেলেরা তা প্রত্যাখ্যান করেন। গভীর দুঃখ-বেদনা এবং তীব্র ক্ষোভে তারা বলেন, ‘সরকার বাবাকে জোর করে বিদেশি বানিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকিয়েছিল। সেখানে বিনা চিকিৎসায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাহলে বিদেশি নাগরিকের মৃতদেহ আমরা নেব কেন?’ ছেলেরা দাবি করেন, ‘আগে সরকার তাঁকে ভারতীয় ঘোষণা করুক, তারপর দেহ নেব।’ পরিবারের এই অনড় অবস্থানে সরকার বেকায়দায় পড়ে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র রাজ্যে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষ। দুলালবাবুর ছেলেদের অনড়-অটল অবস্থানে ডিটেনশন ক্যাম্পের বিরুদ্ধে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন মানুষ। মৃতদেহ বুঝে নিতে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রবল চাপ সৃষ্টি করার পরও টানা দশ দিন দুলালবাবুর ছেলেরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদে লড়াই চালিয়ে যান। অবশেষে সরকার দুলালবাবুর ডেথ সার্টিফিকেটে ‘ভারতীয়’ লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তারা বাবার মৃতদেহ নেয়।

একই ভাবে মৃত্যু ঘটেছে নলবাড়ি জেলায় বরক্ষেত্রী এলাকার সতেমারি গ্রামের বাসিন্দা ফালু দাসের। দরিদ্র এই মানুষটি মাছ ধরে সংসার চালাতেন। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে সরকার তাঁকে ‘বিদেশি’ এবং ‘ডি-ভোটার’ ঘোষণা করে গোয়ালপাড়ার ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকায়। তাঁর পরিবারকেই হয়রান করা হয়। প্রতিবাদে তাঁর পরিজনরাও মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করেছেন।

২১ অক্টোবর এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জিতেন চালিহা ও কমরেড অজয় আচার্য, দুলালবাবুর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, ‘দুলালবাবুর ছেলেদের লড়াকু মানসিকতা রাজ্যের মানুষের বিবেকে প্রবল নাড়া দিয়েছে। নিদারুণ শোকের মধ্যেও টানা দশ দিন তারা তাদের দাবিতে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা ডিটেনশন ক্যাম্প বিরোধী আন্দোলনে প্রেরণা যোগাবে।’ দলের প্রতিনিধিদের সাথে পরিবারের লোকজনের কথাবার্তার সময় দুলালবাবুর ছেলেরা জানান, ডিটেনশন ক্যাম্পের বীভৎস যন্ত্রণার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠবে তাতে তারাও অংশ নেবেন।

পাঠকের মতামত

বিদ্যাসাগর ও ধর্ম

এ কথা ঠিক, বিদ্যাসাগর উপনয়ন ধারণ, পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ সবই করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনীকার গোঁড়া হিন্দু বিহারীলাল সরকার আক্ষেপ করে লিখেছেন, "নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"

ধর্ম বিদ্যাসাগরের জীবনকে কোনও মতেই প্রভাবিত করেনি। খোদ রামকৃষ্ণকে তিনি বলেছিলেন, "তা তিনি (ঈশ্বর) থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোনও উপকার হল না।"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর... আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেননি, তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বলবেন যে, তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষমাত্র ছিল, তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়।"

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধহয় তোমরা জানো না ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়, তখন আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল। যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাংলাদেশে শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, একথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, ডিরোজিও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া যুক্তির পূজা করিতেন। ... চিরকাল পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি?"

বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার গভীর আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছেন, "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি, হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন?" উত্তর বিহারীলাল নিজেই দিচ্ছেন, "বিদ্যাসাগর কালের লোক। কালধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে, হিন্দু ধর্মে আঘাত লাগিয়াছে।" বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই কথা বলেছেন, "তাহার নিত্যজীবনের আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপরদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের লক্ষণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই।"

বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতে কাল্পনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না।"

সংস্কৃত কলেজের পঠনপাঠন সম্পর্কে ব্যালেন্টাইনের উত্তর দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেন, "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়। সম্প্রতি দেশে বিশেষ করে কলকাতায় ও তার আশেপাশে পণ্ডিতদের মধ্যে এক অদ্ভুত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে সেই সত্য সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বাস আরো গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে। তাঁরা মনে করেন যেন শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয়নি।"

বিদ্যাসাগরের সময় থেকে আমরা অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে, হঠাৎ প্রাক-বিদ্যাসাগর, প্রাক-রামমোহন যুগে দেশকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার একটা ফ্যাসিবাদী চক্রান্ত প্রত্যক্ষ করছি। এটিকে প্রতিহত করতে আমাদের পাথেয় হোক বিদ্যাসাগরেরই কথা, "ধর্ম যে কী, তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোনও প্রয়োজন নাই।"

সুকুমার মিত্র, কলকাতা-১২৫

(বিদ্যাসাগরের জীবনসংগ্রাম সঠিকভাবে বুঝতে ২৫ অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যসমৃদ্ধ এই চিঠিটি সহায়ক হবে মনে করে প্রকাশ করা হল।)

অপরাধ-তথ্য গোপনই রাখছে বিজেপি সরকার

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) সম্প্রতি ২০১৭ সালে দেশে ঘটে যাওয়া অপরাধ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। হিংসাত্মক অপরাধের দিক দিয়ে ২০১৬ সালের মতো এবারেও এক নম্বরে রয়েছে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ। মহিলাদের ওপর অপরাধেও শীর্ষে রয়েছে এই রাজ্য। বোঝাই যায়, আইন-শৃঙ্খলা ও নারী-নিরাপত্তা রক্ষায় সে রাজ্যের বিজেপি সরকার আদৌ আন্তরিক ও তৎপর নয়। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যও পিছিয়ে নেই। হিংসাত্মক অপরাধ ও মহিলাদের ওপর অপরাধের ঘটনায় রিপোর্টে তার স্থান তৃতীয়।

কিন্তু যে বিষয়টি এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, রিপোর্টে বেশ কিছু অপরাধের তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। দেশের আকাশ আজ ছেয়ে আছে আছে ফসলের দাম না পাওয়া ঋণগ্রস্ত চাষির হাহাকারে। বছরে বছরে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে নিরুপায় আত্মঘাতী চাষির মর্মান্তিক মৃত্যুমিছিল। অথচ এনসিআরবি-র রিপোর্টে চাষি-আত্মহত্যার কোনও তথ্যই নেই! গত ২০১৫ সাল থেকেই আত্মঘাতী চাষির সংখ্যা প্রকাশ করা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তখন সামনে ছিল ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন। 'আচ্ছে দিন' আর 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'-এর হুঙ্কারে ভরিয়ে তোলা হচ্ছিল আকাশ-বাতাস।

এই অবস্থায় দেশের ব্যাপক সংখ্যক চাষির জীবনের মর্মান্তিক চেহারা কি সামনে আসতে দেওয়া চলে! ফলে ফরমান জারি হয়েছিল রিপোর্ট থেকে মুছে দাও মৃত চাষিদের নামের তালিকা। এবারেও তাই হয়েছে। যদিও সত্য চাপা দেওয়া যায়নি। তথ্যের অধিকার আইনে বেরিয়ে এসেছে রাজ্যে রাজ্যে চাষিদের দুরবস্থার কথা। জানা গেছে, গত চার বছরে বিজেপি সরকারের আমলে মহারাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ৮ জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন। সারা দেশে ২০১৫ থেকে '১৮-র মধ্যে আত্মঘাতী হয়েছেন ১২ হাজার ২১ জন চাষি। অর্থাৎ দিনে প্রায় ১১ জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন। কী মর্মান্তিক পরিস্থিতি! কিন্তু এসব খবর কি প্রকাশ্যে আসতে দেওয়া চলে!

শুধু চাষি-আত্মহত্যাই নয়, ২০১৭ সালে গণপিটুনিতে কতজন খুন হয়েছেন, সে তথ্যও প্রকাশ করেনি এনসিআরবি। অথচ ঘটনা হল, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকে দেশে গণপিটুনি ব্যাপক হারে বেড়েছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত গণপিটুনিতে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর প্রধান সহযোগী অমিত শাহকে একবারও তা নিয়ে মুখ খুলতে দেখা যায়নি। দেশ জুড়ে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক শোরগোল উঠেছে।

সম্ভবত সেই কারণেই রিপোর্টে ঘটনাগুলির উল্লেখ পর্যন্ত নেই! তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্বে রয়েছেন এনসিআরবি-র এমন এক আধিকারিকের বিস্মিত মন্তব্য— গণপিটুনির সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেন তা প্রকাশ করা হল না, উঁচুতলার কর্তারাই তা বলতে পারবেন। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, এই তথ্য যাতে ধামাচাপা পড়ে, সেজন্য কোথা থেকে কলকাঠি নাড়া হয়েছে।

এভাবে গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়ে দেশের আসল চেহারা মানুষের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে কেন্দ্রের সরকার। এই আচরণ বুঝিয়ে দেয়, দেশের নিরাপত্তা নিয়ে নেতা-মন্ত্রীরা যতই হুঙ্কার দিন, দেশের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের মাথা ব্যথা নেই। বরং এ নিয়ে মানুষের ক্ষোভকে তাঁরা ভয় পান।

বিজেপি শাসনে সংবাদমাধ্যমেরও স্বাধীনতা নেই

গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে রাষ্ট্র ও সরকারের সমালোচনার স্বাধীনতা। সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজনও এ কারণেই গণতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিজেপি শাসনে সংবাদমাধ্যম সেই ভূমিকা পালন করতে গেলেই প্রবল বাধার মুখে পড়ছে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে শত কোটি টাকার মামলা, সংবাদমাধ্যমের দপ্তরে আয়কর বিভাগ বা পুলিশের তল্লাশি, এমনকি সাংবাদিকদের প্রাণে মেরে ফেলাও চলছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ভারতের স্থান গত কয়েক বছরে ক্রমশ নিচের দিকে নামছে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে স্কুলের মিড ডে মিলে নুন-রুটি খাওয়া শিশুদের ছবি প্রকাশ করায় এক সাংবাদিককে বিজেপি সরকারের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কাজে ত্রুটি দেখানো তথা সরকারের সম্মানহানি করবার ষড়যন্ত্র, সরকারি কাজে বাধা এবং দেশবাসীর সাথে প্রতারণা ইত্যাদি অভিযোগ তোলা হয়েছে। যে গ্রামবাসী ওই সাংবাদিককে মিড ডে মিল নিয়ে খবর দিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে— তিনি চাইলেই বাজার থেকে সবজি এনে দিতে পারতেন স্কুলকে। তা না করে সাংবাদিক ডেকে এনেছেন, অতএব সেটা ষড়যন্ত্র! স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সাংবাদিকরা সব ষড়যন্ত্রী!

গত জুন মাসে মুখ্যমন্ত্রী যখন মোরাদাবাদে জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান, সে সময় পুলিশ সাংবাদিকদের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে দেয়। কেন? কারণ, যাতে তাঁরা প্রশ্ন করে মুখ্যমন্ত্রীকে বিরক্ত করতে না পারেন। এসবের বিরুদ্ধে মুখ খুললে বা সংবাদ পরিবেশন করলেই 'দেশদ্রোহী' বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে সাংবাদিকদের আদৌ কোনও স্বাধীনতা আছে কি না সে প্রশ্ন তুলেছেন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার প্রাপ্ত এনডিটিভি-র সাংবাদিক রবীশ কুমার। এ প্রসঙ্গে তিনি কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন। ম্যানিলায় এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার নিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, অনেকেই জীবন ও কাজ হারানোর ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকতার কাজ করে চলেছেন, তার জন্য তিনি গর্বিত। কিন্তু বহু সংবাদমাধ্যমই সরকারের তাঁবেদার হয়ে উঠেছে এবং মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে খবর পরিবেশন করছে যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। দেশের সরকারগুলি তো পেটোয়া সংবাদমাধ্যমই চায়।

উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী গোশালা পরিদর্শনের সময় সাংবাদিকদের ডেকে নিয়ে গিয়ে হাসি মুখে ছবি তোলেন, গঙ্গা-স্নানে গেলে ক্যামেরাম্যান সঙ্গে নিয়ে যান, রিপোর্ট করতে দেন। কিন্তু সরকারের কোনও অন্যায্য কাজের সমালোচনা করে খবর পরিবেশন করলে তাদের প্রতি তোপ দাগতে শুরু করেন সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা। সংবাদমাধ্যমকে তাঁরা কার্যত সেবাদাস বানাতে চান। উত্তরপ্রদেশেই গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে খুন হতে হয়েছে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে। অক্টোবরে কুশীনগরে এক হিন্দি সংবাদপত্রের সাংবাদিককে গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে। শাহাজানপুরে দৈনিক জাগরণের এক সাংবাদিক ও তাঁর ভাই গুলিতে খুন হয়েছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাঁরা খবর করছিলেন। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ করে মিলিটারির বন্দুকের মুখে সাধারণ মানুষের জীবনকে ঠেলে দেওয়ার খবর যাতে সংবাদপত্রের পাতায় না আসে সেজন্য বহু সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এর আগে মধ্যপ্রদেশেও বিজেপির আমলে চাকরির পরীক্ষায় বৃহৎ কেলেঙ্কারি 'ব্যাপম'-এর সত্য উদঘাটনে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের রহস্যমৃত্যু ঘটেছে। আজও তার কিনারা হয়নি।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে এক হলফনামায় জানিয়েছে, ইন্টারনেটে 'বিদ্বেষমূলক বার্তা' ও 'ভ্রান্ত সংবাদ' নিয়ন্ত্রণ করতে খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেবে। কারণ, বর্তমান প্রজন্ম সংবাদমাধ্যমের প্রতি নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। বলাই বাহুল্য, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার 'জাতীয়তা বিরোধী' বলতে সাধারণত 'সরকার বিরোধী' বুঝিয়ে থাকে এবং সরকারের সমালোচনাকে 'মানহানি' বলে থাকে। ফলে ডিজিটাল দুনিয়াকে অপরাধ মুক্ত করবার অজুহাতে প্রশাসনকে বিরোধিতা-মুক্ত করবার অপচেষ্টার আশঙ্কা অমূলক নয়।

ফলে কী সংবাদমাধ্যম, কী ডিজিটাল দুনিয়া— সাধারণ মানুষ যাতে এগুলিতে পরিবেশিত নিরপেক্ষ সংবাদে সত্য জানতে না পারে, বিশেষ করে সরকারের জনবিরোধী কাজ ধরতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই সংবাদমাধ্যমের প্রতি সরকারের হুলিয়া জারি— সরকার বিরোধী কিছু প্রকাশ্যে আনা যাবে না। কিন্তু এভাবে ভয় দেখিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। তা শতগুণ, সহস্রগুণ হয়ে প্রকাশ পায়। ইতিহাসই এ কথা বলে।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১৪)

নবজাগ্রত শিক্ষা ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের নামে সমাজে চলতে থাকা বৈষম্য, অন্যায়-অত্যাচারের অন্ধকার দূর করতে হলে কুসংস্কারমুক্ত নবজাগ্রত আধুনিক শিক্ষার উজ্জ্বল আলো জ্বালতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি এ-ও বুঝেছিলেন, ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায়ী তথাকথিত পণ্ডিতদের শোধরানো একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু তাদের প্রভাব থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করা খুবই সম্ভব যদি তাদের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায়। 'বাল্যবিবাহের দোষ' আলোচনায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদসৎ কর্মে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিচার জন্মে এবং বিবেকশক্তির প্রাখর্য বৃদ্ধি হয়।" এই কারণেই বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, আমার জীবন আমি '... জনসাধারণের সুশিক্ষালাভ এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের সুপবিত্র অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠায়' নিয়োগ করব এবং 'সেই ব্রত জীবনের শেষ দিনে আমার চিতাভস্মে উদযাপিত হইবে।' (শিক্ষা পরিষদের সম্পাদককে লেখা চিঠি)।

বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন, তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষায় ভারতের অধিকাংশ ছাত্র বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যবাদের নির্মম শিকারে পর্যবসিত হচ্ছে। যার ফলে, সমাজের ক্রমাগত অধঃপতন নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। এই দুরবস্থার পরিবর্তে তারা যদি ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধের অধিকারী হয়, সমাজকে উন্নত করার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত হয় তা হলে মানবজাতির কতই না অগ্রগতি সম্ভব। তাই বিদ্যাসাগর দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার নামমাত্র কিছু সংস্কার চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন। স্বপ্ন দেখেছিলেন, এ দেশের ছাত্ররা শুধুমাত্র দেশীয় ধর্মীয়শাস্ত্রের বদলে ইউরোপীয় নবজাগরণ-সৃষ্ট পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার সাথে পরিচিত হবে। একমাত্র এর দ্বারাই তারা অন্ধতা-কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ও কর্মমুখী মানুষ হিসাবে বড় হয়ে উঠতে পারবে। এইখানেই বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব। বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, 'যেখানেই আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানের আলো পৌঁছেছে এবং যতটুকু পৌঁছেছে, সেখানে ততটুকু এ দেশীয় শাস্ত্রীয় বিদ্যার প্রভাব কমছে। ফলে এই শিক্ষার প্রসার আরও বাড়াতে হবে।' সেজন্যই তিনি সংস্কৃত কলেজে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী দর্শনের পাশাপাশি পাশ্চাত্য আধুনিক দর্শনও পড়াতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে।" (নোটস অন সংস্কৃত কলেজ)। তাই বিদ্যাসাগর জন স্টুয়ার্ট মিলের লজিক পড়াতে বললেন। মিল ছিলেন মূলত 'ইমপিরিসিস্ট' (অভিজ্ঞতাবাদী) এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। তিনি মনে করতেন, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের বাইরে অলৌকিক কিছু নেই। অন্য অনেক ইমপিরিসিস্ট ব্যক্তিগত ভোগসুখকেই জীবনের সার বলে মনে করেছিলেন। অন্য দিকে স্টুয়ার্ট মিল দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ইমপিরিসিজমের সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক বোধের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মিল-এর লজিক পড়ানো এবং পাশ্চাত্যের অধ্যাত্মবাদী বিশপ বার্কলের দর্শন না পড়ানোর জন্য সুপারিশ করার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর নিজের চিন্তা ও ভাবধারার স্বতন্ত্র পরিচয় রেখেছেন। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারের জন্যে যেসব বই কেনার সুপারিশ তিনি করেছিলেন তার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাসবিদ গিজো-র বই যেমন নির্বাচন করেছিলেন তেমনই ইউক্লিডের জ্যামিতি, নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা, জনস্টন-এর নানা দেশের মানচিত্র, ফরাসি বিপ্লব ও ইংল্যান্ডের বিপ্লবের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ রাখার সুপারিশ করেছিলেন।

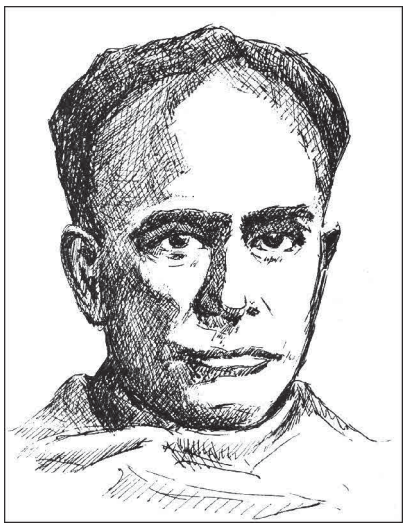

শাস্ত্রজ্ঞ এবং সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গণিতগ্রন্থের পরিবর্তে আধুনিক ইংরেজি গণিত বই পড়ানোর সুপারিশ করেছিলেন শুধু নয়, সাহিত্যশ্রেণির ছাত্রদের জন্যও তিনি গণিতশিক্ষা আবশ্যিক করেছিলেন। কারণ, গণিত কেবল বিজ্ঞানের একটা বিষয় নয়। যে কোনও মানুষের চিন্তার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদ ও চিন্তার শৃঙ্খলা গড়ে তোলার জন্য গণিত শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থগুলি গভীর ভাবে পড়াশুনা করে এ কথা বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই সমস্ত গ্রন্থগুলি সমাজ সম্পর্কে, আধুনিক জীবনের সমস্যা সম্পর্কে, সমাজের সাথে ব্যক্তির যোগাযোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম নয়। সেগুলি সামাজিক সমস্যার উৎসে নজর দেয় না, তার পরিবর্তে দুঃখ-দারিদ্র-নিপীড়নকে মুখ বুজে মেনে নিতে বলে। সেগুলি বলে, অনাহার-অত্যাচার-অশান্তি ইত্যাদি চুপচাপ মেনে নিলে স্বর্গে গিয়ে অনন্ত শান্তি মিলবে। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, ধর্ম ইহকালের সমস্যা সমাধান করতে না পেরে তাকে অদৃষ্ট পরকালে ঠেলে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়। এই ধর্মীয় চিন্তা সমাজের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই বিদ্যাসাগর কোনও দিন, কোনও অবস্থায় এক মুহূর্তের জন্যও ধর্মের আশ্রয় নেননি।

এই কারণেই, বিদ্যাসাগর যেভাবে শিক্ষার পাঠক্রম তৈরি করেছেন এবং যে ধরনের বিষয় অবলম্বন করে পাঠ্য বই রচনা করেছেন, তার মধ্যেও তাঁর আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য 'জীবনচরিত' এবং 'চরিতাবলী' তিনি রচনা করেছেন। এখানে দেখা যায়, বিশেষত দু'ধরনের চরিত্র তিনি বেছে নিয়েছেন। প্রথমত কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ মহান বিজ্ঞানীর চরিত্র— যাঁরা ধর্মীয় ও চিরাচরিত ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ লড়াই চালিয়ে, মূলত বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদ তথা পরীক্ষ-নিরীক্ষা ভিত্তিক জ্ঞানচর্চা সহ সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বিতীয়ত ডুবাল, রস্কো প্রভৃতি চরিত্র— যাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সহায় সম্বল বলতে কিছু না থাকা সত্ত্বেও যাঁরা কঠোর সংগ্রাম করে কেউ বড় দার্শনিক হয়েছেন, কেউ বড় শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি হয়েছেন। এদের জীবনসংগ্রাম বিদ্যাসাগর বাংলায় সহজ-সরল গদ্যে লিখেছেন। ধর্মগুরুদের মতো দারিদ্রের মিথ্যা জয়গান গেয়ে নিপীড়িত দরিদ্র মানুষকে তিনি ভোলাতে চাননি, কারণ সেটা তাঁর নীতি ছিল না। ওই সব বড় চরিত্র কী ভাবে, কোন সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে উঠল সে কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাতে চেয়েছেন, 'তুমি যদি কিছু শিখতে চাও, যদি সমাজের স্বার্থে কাজ করে জীবনকে যথার্থ মর্যাদাময় অবস্থানে প্রতিষ্ঠা দিতে চাও, তাহলে তোমাকেও নানা বাধার বিরুদ্ধে ধৈর্য এবং সাহসের সাথে লড়তে হবে। লড়াই করেই, সেই বাধাগুলিকে অতিক্রম করেই এ-বিশ্বকে আরও সুন্দর করে যেতে হবে। বিদ্যাসাগর বলতে চেয়েছেন, অতিপ্রাকৃত কোনও শক্তির দ্বারা বা কপাল-লিখনের দ্বারা মানুষের জীবন নির্ধারিত হয় না। আর্থিক-সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লেও সচেতন এবং নিরলস সংগ্রাম সঠিক পথে পরিচালনা করে মানুষ বড় কাজ করতে পারে।

বাস্তবে, বড় চরিত্র কঠিন-কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের মানসিকতা ছিল— শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবল উদ্যম-উৎসাহ-অনুপ্রেরণা আনতে হবে এবং প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো শক্তিমান করে তুলতে হবে। তাই দৃষ্টান্তমূলক চরিত্রগুলি কী করে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছেন সেটাই তিনি দেখাতে চেয়েছেন। এগুলোকে তিনি শিক্ষার বিষয় করতে চেষ্টা করেছেন। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্য বই, পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেই তিনি কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, চারিত্রিক উদারতা, কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলির শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

'বোধোদয়' গ্রন্থটি নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে। বোধোদয়ের প্রথম দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হতে দেখা গেল দুটিতেই ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও কথা নেই। এ নিয়ে ইউরোপীয় মিশনারিদের একটি অংশ প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন। জন মার্ডক নামে সরকার নিযুক্ত এক মিশনারি এ নিয়ে তদন্তে আসেন। তাঁর রিপোর্ট খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি রিপোর্টে বললেন, বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' গ্রন্থটি ইংল্যান্ডে মেসার্স চেম্বার্স কর্তৃক প্রকাশিত 'দ্য রুডিমেন্টস অফ নলেজ' গ্রন্থকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। কিন্তু মূল গ্রন্থে আলোচিত 'ঈশ্বর' ও 'আত্মা' সম্পর্কিত অংশ 'বোধোদয়' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বইয়ে সেন্সেস বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা চরম বস্তুবাদ (র‍্যাঙ্ক মেটেরিয়ালিজম) শেখানো হবে। এই বই কেবল একজন নিরীশ্বরবাদীর (সেকুলারিস্ট) দ্বারা লিখিত তা নয়, এই বই প্রস্তুত করাই হয়েছে নিরীশ্বরবাদ শেখানোর জন্য। মার্ডক বলেছেন, বিদ্যাসাগরকে যে 'হিন্দু সংস্কারক' বলা হয়, তা ঠিক নয়। বিদ্যাসাগর কোনও হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলনে নেই, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনেও নেই, তিনি হচ্ছেন সমাজ-সংস্কারক। তিনি আরও বললেন, ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন, সেন্ট সাইমন যেমন সেকুলার, বিদ্যাসাগরও তাই। অতএব যত দ্রুত এই বই স্কুলের পাঠক্রম থেকে বাতিল করা যায়, ততই মঙ্গল। মার্ডকের এই রিপোর্ট পেয়ে সরকারি নির্দেশে বোধোদয়ের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। তখন বাধ্য হয়ে অনুরাগীদের পরামর্শে বিদ্যাসাগর তৃতীয় সংস্করণে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ যুক্ত করেন। সে ক্ষেত্রেও প্রথমে পদার্থ সম্পর্কে আলোচনার পর ঈশ্বর সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি দ্বিতীয় স্থানে রাখেন। এভাবে কোনও রকমে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করলেন যাতে বইটি প্রকাশ হতে পারে।

সব মিলিয়ে বাহান্নটি বই প্রকাশ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৭টি সংস্কৃতে। ৫টি ইংরেজিতে। বাকি ৩০টি বাংলায়, এর মধ্যে ১৪টি বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই। এত কিছুর মধ্যে কোথাও ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্বের কোনও বই নেই। লক্ষণীয়, প্রায় সমস্ত পাঠক্রম থেকে বিদ্যাসাগর সচেতনভাবে ধর্ম, জাতি বা বর্ণের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন। এসব চিন্তাকে তিনি কোনও ভাবে আমল দিতেন না। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার সাথে সাথেই বিদ্যাসাগর কলেজের দরজা সকলের জন্য খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আবার, যেহেতু তিনি ছিলেন একজন প্রখর বাস্তববোধ সম্পন্ন এবং কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, তাই এহেন উদ্যোগ নিয়ে বাড়াবাড়িও করেননি। তিনি বলেছেন, সম্পূর্ণ অবৈতনিক না হলে শিক্ষা সর্বজনীন হবে না। অথচ সরকারি ব্যয়বরাদ্দ অত্যন্ত স্বল্প। তিনি বলেছেন, সাধারণ মানুষ, বলতে যদি শ্রমজীবী মানুষ বোঝায়, তবে তাদের হতদরিদ্র অবস্থা সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের পথে অন্যতম প্রধান বাধা। শ্রমজীবী মানুষ সন্তানের শিক্ষার জন্য এক কপর্দকও খরচ করতে সক্ষম নয়। তা ছাড়া ঘরের সন্তান শিশুশ্রমিক হিসাবে নগণ্য আয় করলেও শ্রমজীবী পরিবারের সেটুকুও না হলে চলে না। তা ছাড়া শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে চাই সমাজ মানসিকতা, উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষায়তন। এই পরিকাঠামো সেদিন ছিল না। তাই তিনি ধাপে ধাপে এগোবার পথ নিয়েছিলেন, যাতে বিরোধিতার ধাক্কায় উদ্যোগ শুরুতেই শেষ না হয়ে যায়।

প্রকাশিত বইপত্রে ধর্ম-ঈশ্বর-পরকাল ইত্যাদি প্রসঙ্গেও কখনও কোনও উগ্রতা তাঁর মধ্যে প্রশ্রয় পায়নি। নানা জায়গায় ছোট ছোট গল্প-কাহিনিতে যেসব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, প্রায় কোথাও তাদের কোনও পদবি ব্যবহার করেননি। কারণ, পদবির মধ্য দিয়ে জাতপাত-বর্ণ-গোত্রের পরিচয় প্রকাশ পায়, আর বিদ্যাসাগর সে-সব ভেদাভেদ কোনও ভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঢোকাতে চাননি। এমনকি পশুদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়েও সব জীবই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলেননি। সচেতনভাবেই তিনি এগুলো বলেননি। 'সীতার বনবাস' লেখার সময়ও ভবভূতির উত্তররামচরিতের অলৌকিক অংশ সযত্নে বাদ দিয়েছেন তিনি। অবতার হিসেবে নয়, গুণবান মানুষ হিসাবেই রাম চরিত্রটিকে দেখিয়েছেন। এরকম আরও উদাহরণ দিয়ে এগুলি দেখানো যায়। এ সবই তাঁর সময়ের সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক মননশীলতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বাঙ্গালোরে ফুড ডেলিভারি কর্মীদের কনভেনশন

কলকাতা, দিল্লি, বাঙ্গালোর সহ দেশের প্রায় সমস্ত বড় শহরে রাস্তায় বেরোলে দেখা যায়, বেশ কিছু যুবক সাইকেলে বা মোটরবাইকে চেপে পিঠে বড় ব্যাগ নিয়ে ছুটছেন। সুইগি, জোম্যাটো বা উবের ইটস ইত্যাদি খাবার ডেলিভারি সংস্থায় হাজার হাজার যুবক এই কাজ করেন। ৩ অক্টোবর এই ফুড ডেলিভারি কর্মীদের একটি কনভেনশন হয় বাঙ্গালোর শহরে। অনেক কর্মী এই কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। তিনি এই সমস্ত অনলাইন নির্ভর কর্মীদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে এঁদের দূর-দূরান্তে খাবার পৌঁছে দিতে হয়। বেশিরভাগ কর্মীকে ১০০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরেও যেতে হয়। কিন্তু এঁদের কোনও স্থায়ী বেতন কাঠামো নেই। প্রতি ডেলিভারির জন্য মাত্র ৩০ টাকা এবং প্রতি ১০টি ডেলিভারি বাবদ ভাতা হিসাবে সর্বাধিক ২৫০-৩০০ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা পেতে হলে তাঁকে সারাদিনে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১০টি ডেলিভারি করতে হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হল, এই নির্দিষ্ট সময় বা লগ-ইন সেশনে ৮/৯টি অর্ডার পাওয়া যায় খুবই সহজে। কিন্তু দশম অর্ডারটি সহজে মেলে না। বহু কষ্টে কেউ কেউ পেয়ে থাকেন,ে বেশিরভাগ থাকেন বঞ্চিতই। এই ভাতাটুকু পাওয়ার জন্য অধিকাংশ ফুড ডেলিভারি কর্মী সারাদিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কয়েকমাস কাজ করার পর অনেককে শ্বাসকষ্ট, স্পাইনাল কর্ডের নানা জটিল সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এরকম কাজে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের কর্মচারীর স্বীকৃতিটুকুও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ইএসআই, পিএফ, গ্র্যাচুইটির সুবিধা থেকে এঁরা বঞ্চিত।

দেশের প্রায় চার লক্ষ ফুড ডেলিভারি কর্মীর জীবন অন্ধকারে নিমজ্জিত। অপরদিকে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি এদের শ্রম লুট করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে। কনভেনশনে এই কর্মীদের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলনে নামার আহ্বান জানানো হয়। কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ ছাড়াও প্রবীণ আইনজীবী কে সুব্বারাও বক্তব্য রাখেন।

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, মদ নিষিদ্ধ করা, বেকারদের কাজ, শ্রমিক-কৃষকের জীবনের নিরাপত্তা সহ ১১ দফা দাবিতে এসইউসিআই (সি)-র ডাকে ১৩ নভেম্বর নবান্ন অভিযান ও শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা অভিযানের দেওয়াল লিখন বাঁকুড়ায়

ব্যাঙ্ক কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার সহ কয়েকটি দাবিতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দু'টি সংগঠন ২২ অক্টোবর দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। ধর্মঘটের প্রতি নৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি অনাদায়ী ঋণ আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজন মতো কর্মী নিয়োগ, স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, এফআরডিআই বিল-২০১৭ বাতিল, জমা টাকার উপর সুদের হার না কমানো সহ নানা দাবির ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ২২ অক্টোবর কলকাতার বিবাদী বাগে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড অনিন্দ্য রায়চৌধুরী, কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল, রতন কর্মকার, গৌরীশঙ্কর দাস, বঙ্কিমচন্দ্র বেরা, আলোকতীর্থ মণ্ডল, নারায়ণচন্দ্র পোদ্দার প্রমুখ। তাঁরা ব্যাঙ্ককর্মী এবং গ্রাহকদের নানা সমস্যা তুলে ধরার সাথে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

রাস্তার দাবিতে আন্দোলনে মহিষবাথানের মানুষ

উত্তর ২৪ পরগণার বিধাননগর কর্পোরেশনের অন্তর্গত চণ্ডিবেড়িয়া সারদানগরের কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াতের জন্য ১৫ ফুট রাস্তা নির্মাণের দাবিতে এবং মৃধা মার্কেট থেকে ঝিলপাড় পর্যন্ত বেহাল রাস্তা সংস্কার ও আলোর ব্যবস্থার দাবিতে 'মহিষবাথান-কৃষ্ণপুর উন্নয়ন সমিতি' ২৪ সেপ্টেম্বর হিডকো ভবনে ডেপুটেশন দেয়। নিউটাউন রূপায়ণে হিডকোর ভুল পরিকল্পনার জন্য সারদানগরে অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড সহ বড় গাড়ি ঢুকতে পারে না। কয়েক বছর আগে সারদা ও নিউটাউন সংযোগকারী ১৫ ফুট রাস্তা ব্যবহার বন্ধ করতে প্রাচীর তোলার চেষ্টা হয়েছিল। সমিতির নেতৃত্বে এলাকার মানুষ সেই অপচেষ্টা প্রতিহত করে। অবিলম্বে এই রাস্তা স্থায়ীভাবে তৈরি করার দাবিতে বহু মানুষের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র নিয়ে এলাকার নাগরিকরা হিডকো অভিযানে সামিল হয়। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে শতাধিক মানুষ এবং টোটো গাড়ি সহ ২০-২২ জন চালক এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। হিডকো কর্তৃপক্ষ দাবি পূরণে দ্রুত কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের পঞ্চায়েত অভিযান

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রাপকদের অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দলবাজি নিয়ে এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। অনুদান তালিকার ক্রম অনুযায়ী না দিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো ব্যক্তিদের দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পাকাবাড়ি থাকা সত্ত্বেও সচ্ছল ব্যক্তিদের অনুদান পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার জবকার্ডের কিছু সমস্যাকে অজুহাত করে বিরোধী দলের সমর্থকদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কাজ হয়নি।

এর প্রতিকারে ২৪ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেয়। যোগ্য প্রাপকদের অনুদান দেওয়ার দাবিপূরণ না হলে পঞ্চায়েত অফিস অবরোধ করা হবে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

হুগলি জেলা জুড়ে আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের বিক্ষোভ

আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম ১৮০০০ টাকা বেতন, সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, ইএসআই ও পেনশনের দাবিতে হুগলি জেলার ব্লকে ব্লকে আন্দোলন চলছে। প্রতিটি সেন্টারের নিজস্ব ভবন ও শৌচাগার তৈরি, মা ও শিশুদের পুষ্টির জন্য খাদ্যের মান ও বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এলাকায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হয়রানি বন্ধের দাবিও উঠছে। হরিপাল ব্লকে তিন শতাধিক, পুরশুড়া ব্লকে দুই শতাধিক কর্মী সহায়িকা মিছিল করে সিডিপিও-কে ডেপুটেশন দেয়। ভদ্রেশ্বর সিপিডিও-কেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। খানাকুল ১ নং ও ২ নং ব্লকে শত শত কর্মী-সহায়িকা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও ডেপুটেশন দেন। ১৯ সেপ্টেম্বর আরামবাগে সহস্রাধিক কর্মী ও সহায়িকা এসডিও দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে চার কিলোমিটার রাস্তা মিছিল করে সিপিডিও-কে ডেপুটেশন দেন তাঁরা। ওয়েস্টবেঙ্গল অঙ্গ নওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের হুগলি জেলা সম্পাদিকা রীতা মাইতি ও সভাপতি শিপ্রা মিত্র বলেন, এখন ব্লকে ব্লকে প্রোজেক্ট ধরে বিক্ষোভ চলছে। ২৪ সেপ্টেম্বর জেলা আধিকারিক ডিপিওকে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই জেলাশাসকের কাছে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে।

মদবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল নারায়ণগড়ে

২২ অক্টোবর পশ্চিম মেদিনীপুরের খুড়শী অঞ্চলে বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্যোগে গঠিত 'মদ বিরোধী নাগরিক কমিটি'-র পক্ষ থেকে আয়োজিত মিছিলে মদের ঢালাও লাইসেন্স বন্ধ করা, নারীদের নিরাপত্তা ও সম্ভ্রম রক্ষার দাবিতে মহিলারা অংশ নেন। চাতুরিভাড়া থেকে মিছিল করে নারায়ণগড় থানার সামনে এসে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। তাঁরা বলেন, ব্লকের খুড়শি, বেকারচক, বৈঁচাআড়া এলাকায় মদ্যপদের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। যুব সমাজ নষ্ট হচ্ছে। এলাকায় বেশ কয়েকটি বৈধ, অবৈধ মদের দোকান থাকায় বাড়ির ছেলেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। পুলিশ জেনেও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এদিন নারায়ণগড় থানার ওসিকে স্মারকলিপি দিয়ে মদের দোকান বন্ধ, দীপাবলির সময় বৈঁচাআড়া-সহ পাশাপাশি অবস্থিত মদের দোকানগুলি বন্ধ রাখা, গ্রামের হোটেলে বসে মদ খাওয়ার বিষয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপের আবেদন জানান মহিলারা।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ ওঝা, সভাপতি খাদিম আলিশা, শচীন্দ্রনাথ মাইতি। মিছিল শেষে পথসভায় উপস্থিত ছিলেন ঝর্ণা জানা, দীপালি মাইতি, কণিকা ধাড়া, মিনতি ওঝা, জ্যোৎস্না মণ্ডল প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com